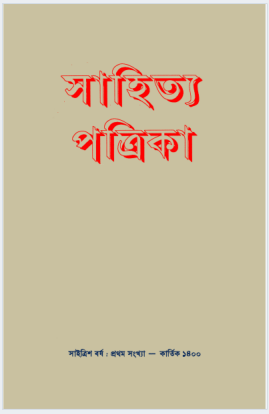

Vol. 37 | No. 1 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম

Volume	37
Issue	1
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সন্‌জীদা খাতুন
Published online	October 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v37i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i1.2
Pages	39-52
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ১

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম

সন্‌জীদা খাতুন *

ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যশিল্পে যে-মনোভাব লক্ষ্য করা যায়, *ধর্ম* নামে সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলির সঙ্গে তার সর্বৈব মিল আছে ব'লে মনে হয় না। অন্ততপক্ষে কাব্যসাহিত্যে তাঁর আত্মার যে ইতিহাস বিধৃত, তার সঙ্গে *'ধর্ম'* গ্রন্থের সকল মতের ঐকাত্ম্য দেখা যায় না। ঐ বইয়ের লেখাগুলি যেন সামাজিক মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিয়ে লেখা। সমকালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রীতিনীতি নির্ধারণ করতে গিয়েও সমাজের ভাবনার দ্বারাই তিনি প্রভাবিত। প্রথাগত ধর্মবোধের পরিচয়ই এই প্রবন্ধগুলিতে প্রধানত প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তিগত উপলব্ধির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার ক্রমিক বিকাশের পথটি তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে ভিন্নভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত নৈসর্গিক সত্যগুলিকে স্বীকার করে মানস-উৎকর্ষ সাধনের ধারায় মানব প্রেমনিষ্ঠ মিলনের পথকেই ধর্মের পথ মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে, ধর্মীয় মূল্যবোধের মৌলিক ঐক্যের দরুণ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যকর্মে প্রকাশিত ধর্মভাবনার পূর্বাপর বিচারে একটি নিগূঢ় ঐক্যও দুর্লক্ষ নয়। আজীবন অভিজ্ঞতায় অর্জিত বিচিত্র উপলব্ধিতে শেষ পর্যন্ত মানব মিলনের পথটিই তাঁর ধর্মের পথ হয়ে উঠেছে।

* প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক

প্রবন্ধে-ভাষণে মানুষের চিন্তার যে প্রকাশ, তার চেয়ে সাহিত্যশিল্পে প্রকাশিত ভাবনা যেন অধিকতর গভীর এবং সত্যভাষণে দীপ্র। রবীন্দ্রনাথের *ধর্ম* (প্রথম প্রকাশ : ১৩১৫)[১] শিরোনামে সংকলিত ভাষণ আর প্রবন্ধগুচ্ছ পাঠ করে আমার এ কথা মনে হয়। সৃজনীশক্তি-মণ্ডিত সাহিত্যে তাঁর বিশ্বাসের যে প্রাণবন্ত পরিচয় উদ্ভাসিত, উল্লিখিত গ্রন্থে সেই প্রাণময়তা এবং তাঁর সুগভীর বিশ্বাসগুলির সর্বৈব সমর্থনও যেন দেখি না। সমসাময়িক পারিবারিক, সামাজিক আর রাজনৈতিক চাপ যেন তাঁর অন্তরকে ক্লিষ্ট করে রেখেছে। আপন কথা আপনার মতো করে বলা হচ্ছে না। এইসব প্রবন্ধ ও ভাষণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে শেষ বয়সের প্রবন্ধ ও বক্তৃতা রচনাকালে আবার আপন বিশ্বাসের রূপটি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে গেছেন তিনি। বাইরের পরিবেশের চাপকে অগ্রাহ্য করে অন্তর্গত সত্যোপলব্ধি তখন দীপ্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের বিশেষ রূপটি অবশ্য আমরা তাঁর প্রথম যৌবনের সাহিত্য থেকেই ক্রমবিকশিত হতে দেখেছি, শেষ বয়সের ঘোষণার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়নি। *ধর্ম* গ্রন্থের বক্তব্যভঙ্গিতেও সতর্ক পাঠক অবশ্য বিচলতি হবেন না। *ধর্ম* যে বিশেষ পর্যায়ের রচনা সেই ধারাতেও রবীন্দ্রনাথ অনেক উল্লেখযোগ্য কবিতা, গান, নাটক রচনা করেছেন। আমরা তাতেও লাভবান হয়েছি, কারণ সেই ধর্মীয় আবেগ থেকে উৎসারিত রবীন্দ্ররচনাও আমাদের জীবনকে শান্তির সন্ধান দিয়েছে, দিয়েছে সান্ত্বনা। বিষয়টি আলোচনাক্রমে বুঝে নিতে হবে।

ধর্মের প্রবন্ধগুলি 'শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ, নববর্ষ বা পৌষোৎসবে, বা/এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবে কথিত বা পঠিত [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩১৩ : গ্রন্থ পরিচয়]। অর্থাৎ জনসমাজকে লক্ষ্য করে, জনসমাজের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ রচনা। সমকালীন ভাবনার তথ্য নেওয়া সে-কারণে প্রয়োজনীয় বলে বোধ হয়।

রবীন্দ্ররচনা বিষয়ক তথ্যমূলক আকরগ্রন্থ নাড়াচাড়া করে বোঝা যায়, ফাল্গুন ১৩০৮ থেকে মাঘ ১৩১৪ সাল, ইংরেজি ১৯০২ থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই লেখাগুলি তৈরি হয়েছে'। এই ছয় বৎসর কালের চিন্তার উপরে স্বভাবতই ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীতে উত্তরণের ফল সম্পর্কিত সাধারণ বুদ্ধিজীবীর চিন্তাভাবনা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন রয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর *রবীন্দ্রজীবনী* দ্বিতীয় খণ্ডে এই প্রতিক্রিয়ার বিবরণ দিয়েছেন :

জাতীয় জীবনে লাভক্ষতির হিসাব খতাইতে গিয়া সে আজ দেখে, জাতি অন্তরে বাহিরে দেউলিয়া, বিদেশীর সহিত দীর্ঘকালের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে একটি প্রাচীন দেশ তাহার সকল সম্পদ হইতে বঞ্চিত, ঐতিহ্য হইতে বিচ্যুত, সংস্কৃতি হইতে ভ্রষ্ট-সে আজ সম্মোহিত, আত্মবিস্মৃত। তাই আজ নানা অভিমানে তাহার অন্তর আচ্ছন্ন, তাহার দৃষ্টি মোহজড়িত, য়ুরোপীয়তার বহির্বাসের সে কাঙাল, প্রতীচ্যের বাণী তাহার কণ্ঠের ভূষণ, তাহার গর্বের বিষয়। [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৫৫ : ১]।

ধর্ম শীর্ষক রচনাগুলির বেশ কয়েকটিতে আমরা রবীন্দ্রনাথকে উল্লিখিত প্রকার বিপন্নতার বোধে আক্রান্ত দেখতে পাব। দেখব তার ফলে, 'কবির মন কী পরিমাণ প্রাচীনভারত-ঘেঁষা ও হিন্দু ভাবাপন্ন' [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৫৫ : ৩৩] হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই রকমের স্বদেশী ভাবনাতেই তখনকার প্রধান চিন্তাবিদ মানুষেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। যে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নারীমুক্তি ও নারীপ্রগতির কর্ণধার, তিনি সেই আমলে নাটক অভিনয়ে স্ত্রীলোকের অংশগ্রহণকে 'অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা' [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৫৫ : ৫২] আখ্যা দিয়েছিলেন। প্রভাতকুমার লিখছেন : 'তাঁহার মত তখন পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল মতের প্রতিনিধি মাত্র' [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৫৫ : ৪২]।

প্রথম যুগের আশ্রমবিদ্যালয়ের কাজে চলাফেরা ওঠাবসায় সতর্ক সামাজিকের মতন চলেছেন রবীন্দ্রনাথ। হিন্দুসমাজের যে-বর্ণভেদ প্রথা রবীন্দ্রনাথের সরব নিন্দার বিষয়, সেই বর্ণভেদের আচার পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে আশ্রমের নীতি হিসেবে আদৃত হয়েছে। পংক্তি বিচার করে আহারের ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ গুরু ছাড়া অন্য গুরুর পায়ের ধুলো নেওয়াতে আপত্তির নিয়ম— সবই পালন করা হয়েছে তখন। ঐ এক কাল, যখন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকের (মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়) কাছে পত্র দিতে হয়েছে—'যাহা হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।' [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৫৫ : ৪২]। আবার পরে পরেই প্রশ্ন করেছেন ;[২] 'অব্রাহ্মণকে প্রণামের ব্যবস্থা কি কোথাও নাই ?' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৫৫ : ৪২)। অথচ ১৩০৯ সালের এই রবীন্দ্রনাথই তো ১২৯৭ সালেই তাঁর *বিসর্জন* কাব্যনাট্যে সবার ঊর্ধে মানুষকে ঠাঁই দিয়ে দেবতার পূজাঞ্জলির ফুল মহৎপ্রাণ মানুষের পায়ে নিবেদন করেছিলেন। সাহিত্যে প্রকাশিত তাঁর বিশ্বাসকে কি তাহলে অবহেলা করব ? সেখানে তাঁকে গভীর

সত্য দ্বারা আলোড়িত দেখিনি কি আমরা ? এই জন্যেই প্রবন্ধের শুরুতে বলেছি যে *ধর্ম* প্রবন্ধগুচ্ছে যা-ই বলা হোক, তাঁর সাহিত্যে আপন ধর্ম উপলব্ধিগত বিশ্বাসের ক্রমিক বিকাশ আমরা লক্ষ্য করে এসেছি। অনেক আগে থেকে ব্যক্তিজীবনের পরিস্থিতি হিসেব করলে দেখি, কবির তখন কঠিন সংকটকাল। স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে ১৩০৯ সালে, কন্যা রেনুকার মৃত্যু ১৩১০-এ, পিতার মৃত্যু ১৩১২ তে, প্রিয় পুত্র শমীর মৃত্যু ১৩১৪ তে। এই দুর্যোগকালে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন আদর্শের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন, সান্ত্বনা খুঁজেছেন উপনিষদের বাণী থেকে। আপন অন্তরকে সংবৃত করে প্রশান্তি লাভের আশায় উচ্চারণ করছেন.—.'বধে বন্ধনে আঘাতে অপমানে দারিদ্র্যে দুর্যোগে, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তুলে'। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪৯ : ৪০৯]।

রাষ্ট্রীয় জীবনে তখন ক্রমে উত্তেজনার তাপ সঞ্চিত হচ্ছে। ১৩০৮ সালে লর্ড কার্জনের ভাষণে, প্রাচ্যের মানুষের চরিত্রে অতিরঞ্জন-দোষের নিন্দার জবাবে রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধে ও চীনদেশে পাশ্চাত্যদেশীয়ের বর্বর লোভের কথা আলোচনা করছেন 'সমাজভেদ' (*বঙ্গদর্শন*, ১৩০৮ আষাঢ়) প্রবন্ধে। পাশাপাশি *নৈবেদ্যের* (১৩০৮) কবিতায় চলছে ঐতিহ্যসমৃদ্ধ স্বদেশের মহিমা স্মরণ এবং অন্যায় ও ভীরুতার সম্মুখে উন্নত মস্তকে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের সাহস অর্জনের প্রার্থনা। সে-প্রার্থনাতেও আছে পূর্ণ ঈশ্বরনির্ভরতার প্রকাশ। ১৩১১ সালে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে আলোড়নসৃষ্টিকারী 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ করছেন রবীন্দ্রনাথ। সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন নির্ভর রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষ না নিয়ে সামাজিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ব্যতিক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করে পক্ষে-বিপক্ষে বাদানুবাদের ঝড় তুলেছেন তিনি। নগরকেন্দ্রিক আন্দোলন পরিহার করে গ্রাম উন্নয়নে প্রবৃত্ত হয়ে দেশের সার্বিক আত্মনির্ভরশীলতা অনুশীলনের কথা বলে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতাদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছেন। বিষয়টিকে কাগজে-কলমে মাত্র নিবদ্ধ না রেখে আপন জমিদারিতে তিনি স্বদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করলেন। আর হিন্দু সমাজের নেতারা অমনি ব্রাহ্ম-রবীন্দ্রনাথের মনে হিন্দুসমাজ ধ্বংস করবার অভিসন্ধি দেখতে পেলেন। হায় রবীন্দ্রনাথ! যে-সমাজধর্মের আকর্ষণে আশৈশবলালিত মানবতাবোধকে অগ্রাহ্য করে অব্রাহ্মণ গুরুকে ছাত্রের প্রণাম থেকে বঞ্চিত করলেন তিনি, সেই সমাজের কাছ থেকে এল এই প্রতিদান। বাস্তবের এই মা'র তাঁর চিন্তার বিবর্তনে সহায় হয়েছিল, এইজন্য ব্যাপারটিকে মঙ্গলজনকই বলতেই হয়। এইখানে আমরা, *'গোরা'* চরিত্রের ক্রমজাগরণের বিবরণে রবীন্দ্রনাথের আত্মচরিতের প্রক্ষেপণের প্রচলিত অভিমতটির কথা স্মরণ করে খুশী হতে পারি।

১৩১০ থেকে ১২ সাল পর্যন্ত সময়ে এদেশের অঙ্গন বড়ই ঘটনাবহুল। ইংরেজের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব, ইউনিভার্সিটি বিলের সাহায্যে ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে উচ্চশিক্ষায় অন্তরায় সৃষ্টি এবং স্কুলগুলিতে স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের প্রস্তাবে ভাষাবিচ্ছেদ ঘটবার সম্ভাবনার প্রতিবাদে, শুধু প্রবন্ধ রচনা করে নিরস্ত না হয়ে, ইংরেজের সামগ্রিক ভেদনীতির বিপক্ষে 'রাখীবন্ধনে'র আয়োজন ক'রে মিছিলে নেতৃত্ব দিলেন রবীন্দ্রনাথ। এক দেশের অধিবাসী হিসেবে স্বাদেশিকতার বোধ উদ্দীপনার জন্য রবীন্দ্রনাথ দেশের মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত বাউল সুরের দেশাত্মবোধক গান রচনা করলেন। তবে, ১৩১২-র শেষ ভাগ থেকে ১৩১৩ নাগাদ রাজনীতির উত্তেজনাময় ক্ষেত্র থেকে রবীন্দ্রনাথ ক্রমে সরে যেতে থাকেন। পরিস্থিতি তখন ঘোরালো। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হচ্ছে, কংগ্রেসের ভিতরেও শুরু হচ্ছে নরমপন্থী-চরমপন্থী দ্বন্দ্ব।

সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গেলেও, *ধর্ম* গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলিতে ১৩০৮ থেকে ১৩১৪ সাল পর্যন্ত সংঘটিত সকল ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে নিরন্তর আন্দোলিত করেছে। এদেশবাসীর বিষয়ে ইংরেজের নিন্দা-উক্তি তাঁকে স্বদেশনির্ভর জাতীয় ঐক্যের দিকে তাড়িত করে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-আদর্শে আস্থাশীল করেছিল, আর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-আঘাত তাঁকে ঈশ্বরে নির্ভরশীল করেছে। যে-ঈশ্বরের কাছে আশ্রয়গ্রহণে তাঁর মঙ্গল ইচ্ছার কাছে, বৃহত্তর অভিপ্রায়ের কাছে ব্যক্তিগত বেদনাকে লীন করা যায়—সেই আদর্শ অবলম্বন রবীন্দ্রজীবনের এই পর্যায়ে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। শরণার্থী রবীন্দ্রনাথের এই জীবন তাঁর দুর্বল অবস্থার প্রতিচ্ছবি। জীবনের কোনও কোনও পরিস্থিতিতে আমরা এ-রকম অবস্থায় পতিত হই বলে রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের সাহিত্য-সঙ্গীত আমাদের সান্ত্বনার উৎসও বটে। প্রাচ্যদেশীয় ধর্মাদর্শ বৃহতের জন্য ক্ষুদ্র আত্মোৎসর্জনের যে প্রেরণা যোগায়, সেই আবেগেই রবীন্দ্রনাথ শোকের ক্ষণে লিখেছিলেন—'অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়' (১৩০৯) অথবা 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই/কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই' (১৩০৯)। *বিসর্জন* (১২৯৭) নাটকের ধর্মবোধের থেকে এই সময়কার ঈশ্বরবোধের রূপ ভিন্ন। সেখানে দেবী প্রতিমার চেয়ে মানুষ হয়েছিল বড় ; আজ দেবতাই হয়েছেন আশ্রয়। সাহিত্যিক আবেগ অঙ্গীকার করে এই সময়ের বিশেষ বোধ স্থান পেয়েছে *'নৈবেদ্য'*, *'গীতাঞ্জলি'* (১৩১৭), *'গীতালি'* (১৯১৪), *'রাজা'* (১৯১০) এইসব কাব্যনাটকে। এসব রচনার আবেগের মর্মস্পর্শিতার প্রমাণ রয়েছে তাঁর বিশ্বস্বীকৃতিতে, রয়েছে বাঙালীর সুখে দুঃখে তিথি পার্বনে এইকালের গানের সমাদরে।

সে যাই হোক, এই পর্বটিকে রবীন্দ্র-ভাবনার ক্রমধারা থেকে খানিক বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে।

দুই

'অহল্যার প্রতি' কবিতাতে, সেই ১২৯৭ সালে, তিনি মর্ত্যভূমির জননী পরিচয় বিবরণে লিখেছিলেন :

যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা, তারি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্যম্পর্শ নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানসহ ধনধান্যরূপে
জীবনে যৌবনে ...

এখানে সন্তানগৃহে জীবন এবং যৌবন সঞ্চারে মর্ত্যভূমি-বহির্ভূত কোনও স্রষ্টার কল্পনা দেখা যায়নি। আর কিছুকাল পরে দেখা যায়, প্রকৃতির সঙ্গে বিস্মৃত পূর্বসম্পর্কের সব বৃত্তান্ত রোমান্টিক অনুভবে শিহরিত হয়ে জাগে কবির অন্তরে ('সমুদ্রের প্রতি' ১২৯৯, 'বসুন্ধরা' ১৩০০)।

পৃথিবী সৃষ্টির আদি কথা এবং প্রথম প্রাণ অঙ্কুর সংক্রান্ত যে-ধারণার প্রকাশ এ-সব কবিতায়, তাতেও সৃষ্টির বাইরের কোনও স্রষ্টার কল্পনা রবীন্দ্রনাথে নেই। পদ্মাতীরের দিনগুলিতে এমনভাবেই তিনি দেখেছেন সৃষ্টিকে। বলেছেন, আজকের জীবনে জেগে উঠবার আগে এই পৃথিবীরই উপাদান হয়ে মাটির সঙ্গে মিশেছিলেন কবি। সেই জীবনের অভিজ্ঞতার স্মৃতিই প্রকৃতির সঙ্গে বিরহের বেদনা জাগায় তাঁর চিত্তে, বসুন্ধরার সঙ্গে পুনর্মিলনে সেই জীবস্রোতের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর :

হে বসুধে-জীবস্রোত কত বারম্বার
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মৃত্তিকাসনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন; তারি সনে

আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে
তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া
সজীব বরণে; আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে। ...

এ অনুভবের আবেগ এত প্রগাঢ় যে কবিকল্পনার নিতান্ত লঘু লীলা ব'লে এ বোধকে তুচ্ছ করা চলে না। নিবিড় উপলব্ধির রঙ এইসব উক্তিতে বিশ্বাসযোগ্যতার গুণ সঞ্চার করে।

জীবনান্তেও মর্ত্যভূমির পরিধির ভিতরে আপন বিচিত্র সঞ্চরণের কল্পনায় ধরিত্রী হতেই জন্ম, ধরিত্রীতেই লয়, আবার ধরিত্রী হতে নবজীবন লাভের বিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হয়েছে :

কবির গমন

ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি ?
চতুর্দিক হতে মোরে লবে না কি টানি
এইসব তরু লতা নদী গিরিবন
এই চিরদিবসের সুনীলগগন,
এ জীবন পরিপূর্ণ উদার সমীর
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবনসমাজ ?
ফিরিব তোমারে ঘিরি, করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয় মাঝে, কীট পশু পাখি
তরু গুল্ম লতা রূপে বারম্বার ডাকি
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে
...

সন্দেহ নেই, এখানে জীবনরস পানের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা কবিকে আলোড়িত করেছে ; তবু, তার সাথে অনন্ত জীবনধারার বিশ্বাসও প্রবাহিত হচ্ছে। বিবর্তনবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বাস তাঁর পত্রধারাতেও অভিব্যক্ত হয়েছে, একথা সর্বজন-পরিজ্ঞাত।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিতেই তাঁর সজীব স্রষ্টাকে দেখতে পেয়েছিলেন যেন, জেনেছিলেন, প্রকৃতি আপনি আপনার সৃষ্টিকে নিরন্তর লালন করছেন। — 'আপনার বক্ষ হতে রসরক্ত নিয়ে/প্রাণটুকু দিয়েছিস সন্তানের দেহে' (১৩০০)। মর্ত্য পৃথিবীর

বাইরের কোনো শক্তির প্রসঙ্গ একালের ভাবনায় দেখি না। প্রাকৃতিক যে শক্তি থেকে পৃথিবীতে জীবযাত্রার সূচনা, সে-ও মর্ত্যভূমির অন্তর্গত শক্তি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। জীবসত্তার পরিচালিকা হিসেবে এই ঐশীশক্তির কাছে কবি প্রণত। প্রকৃতির অন্তর্গত এই প্রাণশক্তিকে কবির ঈশ্বর বলে শনাক্ত করা চলে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনমুখী ভাবনা মানুষেও ঈশ্বরের অধিষ্ঠান সম্ভব বলে জেনেছে। দেবোপম মানবচরিত্রে ঈশিত্ব লক্ষ্য করেছেন তিনি। চরিত্রের ঐশ্বর্যেই ঈশ্বরত্ব। *বিসর্জনে* জীবে প্রেম প্রসঙ্গের সঙ্গে মনুষ্যত্বের আদর্শ ছবি তুলে ধরাও ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। 'এবার ফিরাও মোরে' (১৩০০) কবিতাতে বলেছেন মানব-মঙ্গলের পথে অভিযাত্রার কথা। সত্যের ধ্রুবতারা-অভিমুখে জন্ম জন্ম ধরে এই যাত্রা। জন্ম জন্ম প্রলম্বিত এই যাত্রা একা রবীন্দ্রনাথের নয়- এ মানবজাতির চিরযাত্রা। উল্লিখিত যাত্রায় অন্তরস্থিত 'নিরুপমা সৌন্দর্য প্রতিমা' হচ্ছে অভিযাত্রীর প্রেরণা। এ আদর্শ মানবতার চরম রূপের। একেই ধ্রুব সত্য জেনে মানবমঙ্গলের পথে অগ্রসর হতে থাকলে সে পথ যাত্রীকে নিয়ে চলে মহামানবতার শাশ্বত লক্ষ্যে। মানবতার সারবত্তার ঐ পথটির উপরেই শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মাথা নত হয় প্রথাগত বিশ্বাসের আচার-শাসিত ঈশ্বরকে অস্বীকার করে।[৩]

মানুষের অন্তরে লালিত আদর্শের বোধই মানবযাত্রাপথের নিয়ন্তা। আদর্শের প্রতিমা গড়তে 'শ্রেয়' সংক্রান্ত ধারণাগুলোকে তিল তিল করে এনে সাজাতে হয়। ঐ 'ধারণা'র হদিস পাওয়া যায় পূর্বপূর্ব মহানযাত্রীর জীবনধারা লক্ষ্য করে আর আপন জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত পরম বোধসমূহ থাকে। তাকেই ধ্রুবতারা করে তারই নির্দেশে দিক নির্ণয় করে পথ চলে মানুষ। মানসরচিত এই আদর্শের পরিচয় আমাদের দ্বিতীয় সত্তা হিসেবে।

প্রাণশক্তিতে ঈশ্বর, মানব অন্তরের ঐশ্বর্যে ঈশ্বর, মানবমঙ্গলের পথে মনুষ্যত্বের চরম আদর্শে ঈশ্বর, অন্তর্গত সৃষ্টি দ্বিতীয় সত্তায় ঈশ্বর। ঈশ্বর এমনি করে আমাদের প্রাকৃতিক পরিধির ভিতরেই নানারূপে প্রকটিত। রবীন্দ্রনাথে ঈশ্বরের এত বিচিত্র রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি।

তিন

ধর্ম গ্রন্থে দেশের সেবার সঙ্গে দেশপ্রেমের সঙ্গেও ঈশ্বরকে যুক্ত দেখি। স্বদেশের পূর্ণরূপ তো মানুষকে নিয়েই। মানুষের মূল্যে দেশের তথা বিশেষ ভৌগোলিক পরিধির মূল্য। তাই মানবমঙ্গলের ঈশ্বরকেই এ ভাবনায় ভাস্বর দেখা যায়। *ধর্ম* গ্রন্থে উপনিষদ-ভাবনার অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ; তিনি

শান্তিরূপী, মঙ্গলরূপী, অদ্বৈতরূপী এবং তাঁর প্রকাশ আনন্দরূপে সর্বভূতে বিরাজিত। সর্বভূতে বিরাজিত অর্থে, সকল প্রাণীতে অবস্থিত সত্তার কল্পনায় মর্ত্যসীমা ছাড়িয়ে যাবার প্রয়োজন হয় না। উপনিষদের ব্রহ্মের বিবরণমতে তিনি 'অন্তরতম' আবার 'সুদূরতম'। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অন্তর্যামী জীবনদেবতার উপলব্ধিতেও, দেবতা 'নিত্যমিলনে নিত্যবিরহ' জাগিয়ে রাখেন বলা হয়েছে। অন্তরতমকে খুঁজে পাবার জন্যেই কত দূর দুর্গম পথে তাঁর অবিশ্রাম চলাচল। এসকল ভাবনার ভিতরে মূলগত ঐক্য খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়, তবু উপনিষদের ব্রহ্মের কথা বলতে গিয়ে, তিনি পূর্ণতার আদর্শ হলেও, তাঁর ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে যাওয়া সত্তা কল্পনায় তাঁকে এই মর্ত্যসীমার মধ্যে ধরে রাখা দায় হয়। তিনি যখন বলেন, 'এই যে যাহোক আমরা প্রকাশ বলিতেছি, এ কেমন করিয়া হইল ? তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার আনন্দে, তাঁহার অমৃতে', তখন দেখি এ ইচ্ছা বা আনন্দ বা অমরতা যেন প্রকৃতির অন্তর্গত কোনও শক্তির নয়, প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে অনন্তে বিরাজিত কোনও সত্তার। প্রথাগত ধর্মের ঐকান্তিক বিশ্বাস থেকে উদ্গত প্রার্থনার ভঙ্গিতেই এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি রচিত। তার সঙ্গে অবশ্য তাঁর চিরলালিত মানবমঙ্গলবোধ, প্রেমধর্মবোধ, সত্য জ্ঞান ও সমগ্রের প্রতি আকর্ষণবোধ মিলেমিশে আছে। ঈশ্বরকে স্বপ্রকাশ বলবার যে ভাষাভঙ্গি তিনি এ গ্রন্থে অবলম্বন করেছেন, তাতে তথাকথিত পরমবিশ্বাসী ধার্মিকের ছবিটিই ফুটে ওঠে :

> ...এই সত্যং জ্ঞানমনন্তম আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছেন।...প্রকাশ কোন্‌খানে ? এই যে চারিদিকে যাহা দেখিতেছি, তাহাই যে প্রকাশ। এই যে সম্মুখে, এই যে পার্শ্বে, এই যে অধোতে, এই যে ঊর্ধ্বে-এই যে কিছুতেই গুপ্ত নাই। এ যে সমস্তই সুস্পষ্ট। এ যে আমার ইন্দ্রিয়মনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎস পুরস্তাৎ স দক্ষিণত : স উত্তরতঃ। এই তো প্রকাশ, এ ছাড়া আর প্রকাশ কোথায় ? [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪৯ : ৪৪১]।

মাঘোৎসবের প্রার্থনাসভায় পাঠের জন্য প্রস্তুত রচনা ওটি। আগেই বলেছি মাঘোৎসব, অথবা প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বিবিধ অনুষ্ঠানের জন্যে লেখা এইসব প্রবন্ধ। উপস্থিত ধর্মপ্রাণ শ্রোতৃসমাজের আবেগ জড়িয়ে আছে এ সমস্ত ধর্ম উপদেশে। মনে পড়ে *পত্রপুটের* (১৩৪৩) পনেরো নম্বর কবিতায় কবির সেই স্বীকারোক্তি :

> আজ আপন মনে ভাবি,
> কে আমার দেবতা,

কার করেছি পূজা'
শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর
আজ দেখেছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে।

দেখতে পাই, সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে ব্যক্ত মানবধর্মের কথা *ধর্ম* গ্রন্থের সকল বক্তব্যের মর্মভেদ করে প্রকাশ পেয়েছে। 'ধর্মপ্রচার' প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাত মুখোপাধ্যায় *রবীন্দ্রজীবনী* দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছেন :

> প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ 'মানবের ধর্ম' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মানুষকে জগতের কেন্দ্রে বসাইয়া তাহাকে যে গৌরব দান করিয়াছেন তাহার আভাস পাই আমরা এই প্রবন্ধে। ইহার পূর্বেও *'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'মালিনী', 'চৈতালি'* প্রভৃতি নাট্য ও কাব্যের মধ্যে তিনি সমাজের উর্ধ্বে, মানবধর্মকে লৌকিক ধর্মের উপরে স্থান দিয়াছিলেন। কিন্তু গদ্যে সুস্পষ্টভাবে এই প্রথম এ সম্বন্ধে আত্মমত জ্ঞাপন করিলেন [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৫৫ : ১০৫]।

রবীন্দ্রনাথ উৎসবের দেবতাকে দেখেছেন প্রেমে। তাই বলেছেন, উৎসব দিনের ঈশ্বরোপলব্ধিতে 'আমাদের মনুষ্যত্ব আপন, ক্ষণিক অবস্থাগত সমস্ত দৈন্য দূর করিবে এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য প্রেমের আনন্দে অনুভব ও বিকাশ করিতে থাকিবে' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪৯ : ৩৩৮-৯]। মনুষ্যত্বের সাধনাতেই ঈশ্বরের উপলব্ধি — ফিরে ফিরে এই বিশ্বাস উদ্ভাসিত হয় প্রথাগত ধর্মবিশ্বাস-উদ্ভূত এই রচনাগুলিতেও। সেদিক থেকে বিচার করলে উপনিষদের ব্রহ্মের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যে বিধৃত মর্ত্যসীমাবিহারী নানারূপী ঈশ্বরের মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। কারণ, উভয়ত্র মনুষ্যত্বের মৌল সত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য একাগ্র।

সংহিতাকারদের শিক্ষাব্রতে পর্যন্ত 'সমস্ত জীবনই নাকি ধর্মাচরণ ; কারণ, তাহার লক্ষ্য ব্রহ্মের মধ্যে মুক্তি, সেইজন্য সেই জীবন বহন করিবার শিক্ষাও ধর্মব্রত ছিল। এই ব্রত শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির সহিত নিষ্ঠার সহিত অতিসাবধানে যাপন করিতে হইত। মানুষের পক্ষে যাহা একমাত্র পরমসত্য, সেই সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া বালক

তাহার জীবনের পথে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইত।' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪৯ : ৪৩৩]। এই 'সত্য' লক্ষ্য হওয়াতে, ব্রহ্মাণ্ডের পরিধির ভিতরে বিরাজিত ঈশ্বর এবং ব্রহ্মাণ্ডের জনকরূপী পরমব্রহ্মের কল্পনার ভেদ নিতান্ত বাচনিক হয়ে পড়ে। তবে, শেষাবধি, এই প্রসঙ্গ প্রকারান্তরে নাস্তিকতা আস্তিকতার প্রশ্নটি তুলে ধরে। কিন্তু নাস্তিকের কি ধর্ম নেই ?

উপরের প্রশ্নের আলোচনার সুবিধার্থে কাজী মোতাহার হোসেনের 'নাস্তিকের ধর্ম' *(সঞ্চয়ন)* প্রবন্ধ থেকে কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করব [কাজী মোতাহার হোসেন ১৯৮৪ : ১৫৭-৮ ও ১৬২] :

> নিরীশ্বরবাদী বলে বসলো, 'ঈশ্বর মানুষের মনের সৃষ্টির কল্পনার কারসাজি। অনাদি অনন্ত অবিনশ্বর জড় প্রকৃতিই অন্তর্নিহিত গুণ বলে নির্দিষ্ট নিয়মে আপনাকে আপনি বিকশিত করতে করতে এই বিচিত্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছে।' কিন্তু 'আস্তিক যাকে সৃষ্টিকর্তা বলছেন নাস্তিক তাকেই নামান্তরে প্রকৃতি বলছেন। এমন কি যাঁরা বলছেন বিশ্বের অণু-পরমাণুতে ভগবান প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, প্রত্যেক বস্তুই সাক্ষাৎ ভগবানের প্রকাশ, তাঁরাও তর্ক শাস্ত্রের দুই এক পদ এদিক ওদিক করে ঐ একই কথা বলছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে এঁরা ভগবানকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে চিন্ময় পরিচালকরূপে কল্পনা করছেন, আর প্রকৃতিবাদী বা নাস্তিক বলছেন জড়প্রকৃতির ভিতরই চিন্ময়ত্ব আছে, জড় ও চিৎ একই বস্তুর দুই অচ্ছেদ্য রূপ, জড়কে চালিত করবার জন্য জড়াতীত স্বতন্ত্র চিৎপদার্থের বা চিন্ময় পুরুষের কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন।' 'সৎপ্রবৃত্তির অভ্যাস করতে করতে মানুষ ক্রমশঃ বিবর্তনের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করছে। প্রকৃতিবাদীর কাছে এইসব সোপানই সপ্তস্বর্গ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আস্তিকের স্বর্গ-নরকের ন্যায়, বিবর্তন-সোপানের উঁচু নীচু ধাপগুলিই প্রকৃতিবাদীর সদসৎ কর্মের নিয়ন্ত্রক। আস্তিক যেমন আত্মাকে অবিনাশী মনে করে, প্রকৃতিবাদীও তেমনি এক অখণ্ড মানবতায় বিশ্বাসী।

ভাবনাগুলোকে এইরকম উল্টেপাল্টে দেখলে আস্তিকের সঙ্গে আলোচ্য ধরনের নাস্তিকের পার্থক্য কেবল কথার কথা হয়েই দাঁড়ায়। কারণ রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার প্রকার পর্যালোচনা করতে গেলে তাঁর প্রকৃতিবাদী চরিত্রই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

জীবনের জটিল-বন্ধুর পথপরিক্রমায় উপর্যুপরি আঘাতে পর্যুদস্ত অবস্থাতে একসময় ভক্তিবাদী আস্তিকের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন, সন্দেহ নেই। পরাধীন জাতি হিসেবে অপমানের আঘাতও সেইসময়ে এত প্রবল ছিল যে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন আদর্শকেই একান্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। 'গোরা' রূপী রবীন্দ্রনাথের কথা এখানে পুনর্বার স্মরণ করা যায়। গোরার মত এই রবীন্দ্রনাথও

মানুষ হিসেবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁর দেশের মাটিতে। *ধর্ম* প্রবন্ধগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনাত্মক মন্তব্য :

> বৈদিক ভারতের তপোবনের যে অপরূপ চিত্র বাক্যের ইন্দ্রজালে তিনি আঁকিতেছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ কবিকল্পনা। চিরদিনই ভাববিলাসী সাহিত্যিকরা এই আদর্শলোকের স্বপ্ন দেখিয়াছেন....। রবীন্দ্রনাথের তপোবন সেইরূপ একটি অন্তরের সৃষ্টি। হিন্দুভারতের বর্ণাশ্রম-আদর্শ কবিকে এমনি মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি আজ প্রাচীন ভারতের সমস্তকেই মহান ও রমণীয় করিয়া দেখিতেছেন [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৫৫ : ২৩১-৩২]।

রবীন্দ্রনাথের কাছে 'হিন্দু' নামের তাৎপর্য কি ছিল, তাও বিবেচনায় আনা দরকার। কারণ, 'হিন্দু' নামটি তাঁর আলোচ্য গ্রন্থ রচনাকালের ধর্মভাবনার সঙ্গে খুব জড়িয়ে গেছে। ১৩১৯ সালে রচিত 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দু'-সংক্রান্ত ধারণার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় :

> হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্য পর্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাতপ্রতিঘাত পরম্পরার একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৭২ : ৪৬৪]।

একজাতীয়তার পরিচয়ের মূল নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন—'এক বিশেষ ভূখণ্ড ও বিশেষ ইতিহাসের মধ্যে এই যে জাতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মানুষ হইয়াছে এই জাতি আপন ব্যক্তিগত কালগত সমস্ত বৈচিত্র্য লইয়াও এক....জাতি' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৭২ : ৪৬৪]। এই যুক্তির অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ আরও বহুদূর অগ্রসর হন :

> তবে কি মুসলমান অথবা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার ? নিশ্চয়ই পারি।...ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশায় হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন....। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রীস্টান। খ্রীস্টান তাঁহাদের রং, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা

প্রকৃতই হিন্দু মুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রীস্টান এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৭২- : ৪৬৪)।

এরকম কথা শুনলে আমরা আমূল চম্‌কে উঠি, যেন কাঁঠালের আমসত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু উল্লিখিত প্রকার আদর্শ তথা দূর ভবিষ্যতের সত্যকে কল্পনায় রেখেই সেই মঙ্গল-সুন্দরের পথে রবীন্দ্রনাথের যাত্রা। ভেবে দেখলে, রবীন্দ্রনাথের এই হিন্দুত্বের সাধনার কথাও শেষ পর্যন্ত মনুষ্যত্বের সাধনার কথাই বলে। 'হিন্দু' নাম সম্পর্কে আমাদের অন্তরে প্রোথিত সংস্কার বক্তব্যটির মর্মে প্রবেশের বাধা বলেই কেবল বিষয়টিকে গ্রহণ করা কঠিন মনে হয়।

ধর্ম গ্রন্থে বর্ণিত ব্রহ্মের উপাসনার লক্ষ্যও 'মনুষ্যত্বের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করা' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৫৫ : ৩৭৯] নয়। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী ভাবনাসম্মত বিচারে—'ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪৯ : ৩৭৯]।

উপসংহারে বলতে হয়, এইসব প্রবন্ধে ভাষণে বিষয়গুলিকে প্রচলিত বিশ্বাসের ধারাতে বর্ণনা করলেও সকল চিন্তা রাবীন্দ্রিক বিন্যাসে শাশ্বত মানবতাবোধের বিশেষ ধারাতেই এসে মিলিত হয়েছে, যে ধারা তাঁর কাব্যে সাহিত্যে স্বতঃস্ফূর্ত গতি পেয়ে মনোযোগী পাঠকের অন্তরকে অভিসিঞ্চিত করেছে মানবপ্রেমে। জীবনের বিশেষ পর্যায়ের ভাবের ঘোর কেটে গেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমকে যেমন সকল সংকীর্ণ চিন্তা থেকে মুক্ত করেছিলেন, তেমনি অবলম্বন করেছিলেন সকল গণ্ডি-ছাড়ানো 'মানুষের ধর্ম'। তাঁর সমগ্র জীবনের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ধর্মভাবনায় তাঁর এই উত্তরণের পরিচয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

টীকা

১. বিশ্বভারতী ১৯৬১ সংস্করণে 'শান্তংশিবমদ্বৈতম্' রচনার নিচে রচনাকাল হিসেবে '১৩১৬' সালের উল্লেখ মুদ্রণপ্রমাদমূলক মনে হয় ; কারণ, *গদ্যগ্রন্থাবলীর* ষোড়শভাগ হিসেবে *ধর্ম* ১৩১৫ সালেই ছাপা হয়ে গেছে। তা ছাড়া, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জীতে* '১৯০৬ (১৩১২-১৩ ।। ১৮২৭-২৮ শক)' ডিসেম্বর মাসের

বিবরণে শান্তিনিকেতনের পৌষোৎসবের ভাষণ হিসেবে 'শান্তংশিবমদ্বৈতম্' লেখাটির উল্লেখ রয়েছে। কাজেই আসল রচনাকাল ১৩১৩ সাল বলেই ধারণা হয়।

২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়।

৩. *পত্রপুটের* পনেরো সংখ্যক কবিতা ১৩৪৩।

গ্রন্থপঞ্জি

কাজী মোতাহার হোসেন — সঞ্চরণ, *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*।
১৯৮৪ — ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — *রবীন্দ্র জীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড। পরিবর্ধিত সংস্করণ
১৩৫৫ ? — কলকাতা : বিশ্বভারতী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড।
১৩৪৯ — কলকাতা : বিশ্বভারতী।
১৩৭২ — *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তবিংশ খণ্ড।
কলকাতা : বিশ্বভারতী।